দৈনিক ইনকিলাব

২৮/৭/২০০৮

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...২...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ঘুষ, দুর্নীতির আখড়া

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন দুর্নীতি এবং অনিয়মে ছেয়ে গেছে। প্রশাসনিক ভবনের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীই দুর্নীতিতে লিপ্ত। হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীই দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের আখের গুছিয়েছেন।

প্রশাসনিক ভবনের যে সব বিভাগে দুর্নীতি রয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে প্রি-অডিট সেকশন। এছাড়া প্রকৌশল বিভাগ, ভর্তি সেকশন, সার্টিফিকেট বিতরণ বিভাগ, বৃত্তি বিভাগ, স্টোর বিভাগ, পরিবহন এবং মেডিকেল সেন্টার প্রভৃতি বিভাগেও দেদার চলছে দুর্নীতি ও অনিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেউ অফিসের সময়সূচি মানেন না। অফিস করেন তাদের ইচ্ছামতো। বিধান অনুযায়ী ১০টায় আসার কথা থাকলেও অনেকেই অফিসে আসেন ১১টা-সাড়ে ১১টায়। ১২টা সাড়ে ১২টা বাজতেই চলে যান মধ্যাহ্ন বিরতিতে। আবার ফিরে আসতে তাদের ৩টা সাড়ে ৩টা বেজে যায়। সাড়ে ৪টা বাজার আগেই এরা অফিস ত্যাগ করেন। 'এসব দেখার যেন কেউ নেই।

প্রশাসনিক ভবনের অনেক টেবিলেই-ফাইল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নজরানা ছাড়া ফাইল নড়ে না। ফলে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ হচ্ছে প্রি-অডিট। এখানকার কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বড়লাট' হিসেবে পরিচিত। যতো টাকারই হিসাব তারা নিরীক্ষা করুন না কেন শতকরা ৫ টাকা কমিশন তাদের দিতেই হয়। উপাচার্যের দপ্তরের হিসাব করতেও তারা এই পারসেনটেজ পেয়ে থাকেন বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংগঠনের অনুদানের টাকা তুলতে গেলেও এদের হাতে হয়রানির শিকার হতে হয়। এখানকার কর্মকর্তারা নিজেরাই প্রচার করে বেড়ান তাদেরকে ম্যানেজ করতে খোদ উপাচার্যের দপ্তর থেকেই তাদের জন্য চা-কফি পাঠানো হয়।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, ওরা প্রতিদিন এখান থেকে চা-কফি নেয় তবে এই চায়ের সঙ্গে ম্যানেজ করার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্প্রতি একটি ঘটনায় এই বিভাগ থেকে ১১ হাজার টাকার একটি বিল পাস করিয়ে আনতে সাড়ে ৬ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয় বলে জানা যায়।

দুর্নীতি এবং অনিয়মের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রকৌশল বিভাগ। এখানকার প্রধান প্রকৌশলী কয়েকদিন পর পর সরকারি নির্দেশে ডেপুটেশনে আসেন। এ কারণে তার ক্ষমতা, প্রভাব কম থাকে। এ সুযোগে এখানকার কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেট। এদের বিরুদ্ধে অসংখ্য সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এখানকার একজন পিওন ঢাকায় বাড়ি করেছেন বলে জানা যায়। আরেকজন পিওন তার ছেলেকে আমেরিকায় পড়তে পাঠিয়েছেন। এই বিভাগের জনৈক কর্মকর্তাকে শতকরা হারে কমিশন দিতে হয়। নচেৎ ফাইল নড়ে না। কমিশনের পরিমাণ কম হলে বা কমিশন না দিলে ফাইল গায়েব হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

গত জুন মাসে এ ধরনের ফাইল গায়েব হওয়ার একটি ঘটনা ঘটে। প্রকৌশল বিভাগের দুর্নীতির বিষয়টি কর্তৃপক্ষ অবগত থাকলেও এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল হাসেম একজন উপসহকারী প্রকৌশলীর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তাকে ঘুষ গ্রহণ করান। ৫০ হাজার টাকা থেকে এই উপসহকারী প্রকৌশলী ১০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। পরে কোষাধ্যক্ষ তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন। তথ্য প্রমাণ হাজির করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন।

প্রশাসনিক ভবনের ১২৪ নং কক্ষের এক সুদর্শন কর্মকর্তা এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃতি বিভাগের এক ছাত্রকে এক বছরের ভর্তিকে দুই বছর দেখিয়ে এক বছরের টাকায় ভর্তি করবেন শর্তে ১ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন।

সার্টিফিকেট বিতরণ বিভাগের বিরুদ্ধে বড়ো অভিযোগ হলো এই বিভাগের গুটিকয়েক কর্মকর্তা সার্টিফিকেট জাল করায় সহায়তা করছে। এই বিভাগে একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী পিওন আছেন যিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট বিতরণ বিভাগে ফাইল আনা-নেওয়ার কাজ করেন। তাকে একাজে ১০/২০ টাকা হাতে গুঁজে না দিলে তিনি ফাইল নিতে গড়িমসি করেন। একাধিক দিন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে।

স্টোর বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা চোরের গুদাম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি একবার স্টোর রুমে পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখতে পান কাগজপত্রে যে কয়টি টিউবলাইট রয়েছে তার তিনভাগের এক ভাগও বাস্তবে নেই। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বলে ফেলেন 'যতো সব চোরের দল'।

পরিবহন বিভাগে চলছে টাকা খাওয়ার হরিলুট। পরিবহন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের টাকা কামানোর মূল উৎস হচ্ছে তেল এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশন। বাসের তেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে পরিবহন বিভাগে। নতুন যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এসব কাজে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অনিয়ম রয়েছে বলে সূত্র জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে প্রায় ২৪ জনের মতো ডাক্তার থাকলেও ছাত্ররা কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে অনেক ছাত্রই অভিযোগ করেছে ডাক্তার রোগের কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনেই ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। এবং ছাত্ররা যে অসুখ নিয়েই যান না কেন অধিকাংশ ব্যবস্থাপত্রেই প্যারাসিটামল এবং নাপা দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে এখানকার দামি ওষুধগুলো গোপনে বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিক্রি করে দেওয়া ওষুধের টাকা থেকে প্রাপ্ত অর্থ শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে পিওন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে ভাগ পান। ডাক্তারদের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। এসব নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের তাতে কিছু আসে যায়নি।

বাংলা থেকে ইংরেজিতে সার্টিফিকেট লেখার বিভাগটিতে সব ছাত্রছাত্রীকেই হয়রানির শিকার হতে হয়। এই বিভাগে কোনো কাজ করতে গেলেই ছাত্রছাত্রীদের ২/৩ মাস পর আসতে বলা হয়। সেক্ষেত্রে একমাসের বা অল্পদিনের মধ্যে কারো এ জাতীয় সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হলে 'উপরির' উপরই ভরসা করতে হয়। লোক চিনে টাকা-পয়সা দিতে পারলেই কয়েকদিনের মধ্যে কাজ আদায় করা যায়।

এই বিভাগে কাজ করতে এসে ভোগান্তির শিকার উইমেন স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র শিমুল জানান, 'গত দুই মাস ধরে ঘুরছি সার্টিফিকেটকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সফারের জন্য। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।'

ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষার ফিস দিতে, ভর্তি হতে দেরি হলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে জরিমানা করা হয় তা নিয়ে প্রশাসনিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীদের কাছে গেলে কমিশনের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীরা জরিমানার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেন। এ ঘটনা ঘটছে দেদার।

প্রশাসনিক বিভাগের অধিকাংশ বিভাগেই চলছে হরিলুট। কমিশন সিস্টেম সবগুলো সেকশনকে আক্রমণ করেছে ক্যান্সারের মতো। এই সিস্টেম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ আইন উপদেষ্টার বিভাগটিও বাদ পড়েনি। আইন উপদেষ্টা বিভাগের জন্য প্রতিবছর বাজেটে বরাদ্দ থাকে ৭ লাখ টাকা। কিন্তু প্রতিবছর খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ লাখ টাকা যা প্রাপ্ত বরাদ্দের দ্বিগুণেরও বেশি। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য যেসব আইনবিদদের নিয়োগ করা হয় তাদের সঙ্গে কমিশনের কন্ট্রাকটিও সেরে ফেলে এই বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত এক মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারী জানান, ত্রিশ বছর ধরে তিনি এই বিভাগে কাজ করলেও অবসরের শেষ সময়ে এসে এখন পর্যন্ত কোনো বাসা বরাদ্দ পাননি। বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে তার কাছে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের সভাপতি এবং সেক্রেটারি ১০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করলে তিনি দিতে রাজি হননি বলে এই প্রতিবেদককে জানান। এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে তার অভিযোগ জানালেও 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ায়' ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে এখন পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

বাসা বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ট্রেজারারের বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার তার লাইব্রেরিতে কর্মরত জনৈক আত্মীয়াকে বিধিবহির্ভূতভাবে বাসা বরাদ্দ দেন বলে জানা যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পিওন মোখলেসুর রহমানও চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার ২/৩ মাসের মাথায় অবিবাহিত অবস্থায় বিধিবহির্ভূতভাবে বাসা বরাদ্দ পান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে।